

ন্যায্য ও নিরাপদ পোষাক শিল্পের সন্ধানে

আ হ সান মো হা ম্ম দ

ভাংচুর কিংবা অগ্নিসংযোগের ঘটনা এ উপমহাদেশে নতুন কিছু নয়। কিন্তু রাজনৈতিক হানাহানি ও অস্থিরতা থেকে এতোদিন বাংলাদেশের রফতানীমুখী পোষাক শিল্পকে সযত্নে দূরে রাখা সম্ভব হয়েছিল। সকল সরকারের আমলেই বিরোধীদলগুলো এ শিল্পকে হরতালের আওতামুক্ত রাখতো। এর মধ্যে হঠাৎ করেই কয়েকদিন আগে শিল্প ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়। একের পর এক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে হামলা হয়, ভাংচুর চলে, এমনকি আগুনও লাগিয়ে দেয়া হয়। জাতি হতবাক হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি আপাততঃ শান্ত হলেও শিল্প মালিকেরা আবারও এ ধরনের ঘটনা ঘটান সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। এই হঠাৎ ধ্বংসযজ্ঞের কারণ হিসাবে দুটি মত রয়েছে। কেউ বলছেন, এর পিছনে কাজ করেছে দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জীভূত শ্রমিক অসন্তোষ। অন্যেরা এ ঘটনার পিছনে বিদেশী-দেশী ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন। সবকিছুর মত এর সাথেও রাজনীতি জড়িয়ে গেছে। তবে রাজনৈতিক বা গোষ্ঠী চিন্তার উর্দে উঠে এর পিছনের কারণগুলো খুঁজে বের করা দরকার এবং সে কারণগুলো দূর করা বা তা প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

যারা বলছেন যে শিল্প ধ্বংসযজ্ঞের পিছনে গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ মূল ভূমিকা পালন করেছে, তারা শ্রমিকদের বেতন-ভাতার স্বল্পতা ও অনিয়ম, অনুন্নত কাজের পরিবেশ, ছুটির অভাব ইত্যাদির কথা বলছেন। এ শিল্পের শ্রমিকদের অধিকাংশই নারী এবং তারা খুবই কম বেতনে কাজ করে। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, এ শিল্প বাংলাদেশে অমানুষিক শ্রমশোষণের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করার বিনিময়ে শ্রমিকেরা যা উপার্জন করে তা দিয়ে তাদের পেট চালানো দায় হয়ে পড়ে। তাদের অধিকাংশের বেতন এক হাজার টাকারও কম। মাথা গৌঁজার ঠাই টুকুর জন্য তাদেরকে ভাড়া দিতে হয়। সবথেকে সস্তা যানবাহনেও যাতায়াতের ক্ষমতা তাদের থাকে না। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা পায়ে হেটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তাদেরকে কর্মস্থলে যেতে হয়। এর পরও বেতন, বোনাস, ওভারটাইম ইত্যাদি সময়মত দেয়া হয় না বলে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে।

তবে শিল্প মালিকদের এবং রাজনীতিক, অর্থনীতিবিদ ও সুশীল সমাজের একটি বড় অংশের ধারণা এটি শ্রমিক অসন্তোষ নয়, বরং বিদেশী ও দেশী কয়েকটি মহল পরিকল্পিত উপায়ে এই ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়েছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, যে সকল গার্মেন্টস কারখানায় ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে সেগুলি দেশের সব থেকে সফল কারখানাগুলোর অন্যতম। শুধু তাই নয়, যে সকল সীমিত সংখ্যক কারখানা কমপ্লায়েন্সের আওতায় নিজেদেরকে আনতে পেরেছে, তারা তাদের মধ্যে রয়েছে। এ সকল কারখানায় কাজের পরিবেশ অন্য কারখানার থেকে উন্নত। প্রশ্ন উঠছে যে শ্রমিক অসন্তোষ থেকে যদি এ ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা হয়, তাহলে তা সেই সব কারখানা থেকে শুরু হলো কেন, যাদের কাজের পরিবেশ ও বেতন কাঠামো সবথেকে উন্নত? তাছাড়া অগ্নিদগ্ধ হয়ে বা ভবন ধ্বংসে শ্রমিক মৃত্যুর মত যে সকল ঘটনায় শ্রমিকদের মারমুখী হয়ে ওঠার কথা ছিল সকল ঘটনায় তারা কোন ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটায়নি। কারখানায় আগুন ধরে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন অনেক শ্রমিক। সেখানে পুরো দোষ ছিল কারখানা কতৃপক্ষের। একদিকে যেমন অগ্নি নির্বাপনের কোন ব্যবস্থা ছিল না, তেমনি কারখানার গেট তালা বন্ধ থাকায় শ্রমিকেরা বের হতে পারেনি। কারখানার বহুতল ভবন ধ্বংসে বহু শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনাও

বারংবার ঘটেছে। সে সকল সময়ে শ্রমিকেরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছে, সহিংস হয় নি। অথচ, এখন এমন কি ঘটলো যে শ্রমিকেরা একের পর এক কারখানায় আগুন ধরিয়ে দিতে গেল?

সকলেই স্বীকার করছেন যে, গার্মেন্টস শিল্পে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ দেশগুলো এই ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এক বাক্যে বলেছিল যে কোটা উঠে গেলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প টিকতে পারবে না। তাদের সে সকল ভবিষ্যৎবাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করে কোটা পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পোষাক শিল্পে অভাবনীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। গার্মেন্টস শিল্পের জন্য এখন একটি 'টেক-অফ' পর্যায় চলছে। একটি উড়োজাহাজের উড্ডয়নের মুহূর্তটি যেমন সবথেকে সম্ভাবনাময় তেমনি সবথেকে বিপদজনক। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের অবস্থা তেমনি। এ অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটানো সহজ এবং তাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মারাত্মক হতে পারে। তাছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এ হামলাকে অনেকে কৌশলগত দিক বিবেচনা করে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী তেলের অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি, আমদানী বৃদ্ধি, মোবাইল কোম্পানীগুলোর মুনাফা ডলারে বিদেশে পাঠানো এবং ওভার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচারের পরও বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রার সংকট মোকাবেলা করতে পারছে পোষাক শিল্প থেকে বিপুল রফতানী আয়ের কারণে। এ মুহূর্তে পোষাক শিল্পে ধস নামানো গেলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা খুব সহজেই নষ্ট করা যাবে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একের পর এক অপপ্রচার চালিয়ে এবং দেশে জঙ্গীবাদের জন্ম দিয়ে যা করা যায় নি গুটি কয়েক লোককে দিয়ে কয়েকটি কারখানায় আগুন দিয়ে সে লক্ষ্যের অনেকটাই অর্জন করার চেষ্টা হতে পারে।

অনেকে আবার এ হামলার সাথে বিরোধী দলের সম্পর্ক থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছেন। সরকারী দলের নেতারা তো রাখঢাক না রেখেই এ ঘটনার জন্য বিরোধী দলকে দায়ী করেছেন। সব কিছুর জন্য বিরোধী দলকে দায়ী করার প্রবণতা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ইস্যুতে গোলোযোগ সৃষ্টির পিছনে বিরোধী দল যেভাবে প্রকাশ্যে ভূমিকা রাখছে, তাতে এ ধরণের সন্দেহ উড়িয়ে দেয়া কঠিন। মাত্র কদিন আগে বিনা কারণে বিরোধী দলীয় কর্মীরা প্রকাশ্যে দিবালোকে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে যানবাহন ধ্বংসযজ্ঞে নামে। তারপর দেশের একটি বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্যকে তার বাসায় পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। এ কথা সবাই বুঝতে পারছে যে বর্তমান সরকারের বাকী পাঁচ মাসে বিরোধী দল বড় রকমের কোন গোলোযোগ বাধানোর চেষ্টা করছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই যে কোন ধ্বংসাত্মক ঘটনার সাথে তাদের নাম উঠে আসছে। তাছাড়া, এ সকল হামলা ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগের ঘটনায় যাদেরকে নেতৃত্ব দিতে টিভি ক্যামেরায় দেখা গেছে, তদন্তে বেরিয়ে আসছে যে, তাদের প্রায় সকলেই বিরোধী দলের স্থানীয় নেতা। অনেক শিল্প মালিক এর জন্য সরাসরি কিছু এনজিওকে দায়ী করেছেন। ঘটনার আগে ও পরে ঐ সকল এনজিও মালিকদের ভূমিকা এ অভিযোগের শক্ত ভিত্তি দিয়েছে। যে সকল এনজিও এ হামলায় সরাসরি মদদ দিয়েছে বলে অভিযোগ আসছে তাদের অধিকাংশের মালিকেরা বিরোধী দলের সক্রিয় সদস্য। এখনও পর্যন্ত দলটি এ হামলার নিন্দা করে নি এবং এমন সব বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে যাকে উস্কানিমূলক না বলার উপায় নেই। সরকারের ভূমিকাও প্রশংসিত হয়েছে কেননা, যখন একের পর এক কারখানায় হামলা হচ্ছিল, ভাংচুর চলছিল ও আগুন ধরিয়ে দেয়া হচ্ছিল, তখন পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখা গেছে। অনেকে বলতে চাচ্ছেন, পুলিশ দেখেছে যে তারা এ হামলা ঠেকাতে পারবে না; গুলি ছোড়ার মত পদক্ষেপ নিয়ে পরিস্থিতির আরও অবনতি করতে তারা চায়নি। তবে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণ কি শুধু এটুকুই ছিল নাকি এর পিছনে পুলিশের বড় কর্তাদের কোন স্বার্থ ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অনেকেই বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছেন না;

কেননা পুলিশের সহায়তা নিয়ে ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল প্রচেষ্টার সাথে অতি উচ্চ পর্যায়ে ব্যক্তিদের যোগাযোগের অভিযোগ বারবার উঠছে। তাছাড়া স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন যে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক ঘটনার আগাম খবর গোয়েন্দারা দিয়েছিল। তারপরেও কেন কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি, তা সত্যিই রহস্যময়। সরকারকে এ রহস্যে ভিতরকার তথ্য জাতির সামনে প্রকাশ করতে হবে।

সবদিক বিবেচনা করলে দেশী-বিদেশী চক্রান্ত বা শ্রমিকদের ক্ষোভ কোনটিকেই পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। একটি বড় দেশ যা প্রচন্ড রকমের বর্ণবাদী সংস্কৃতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, তার পাশে একটি ছোট দেশ কখনই শান্তিতে থাকতে পারে না। সে হিসাবে শ্রীলংকা বা নেপালের থেকে বাংলাদেশের ভাগ্য বরং ভালোই বলতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করা হবে, বাংলাদেশকে অকার্যকর প্রমাণ করার জন্য কাজ করা হবে এবং এ দেশের মানুষের আদর্শ ও সংস্কৃতি থেকে সে সকল উপাদান বিনষ্ট করতে চাওয়া হবে যা আমাদের স্বাধীনতার চেতনাকে বলীয়ান করে - এটাই স্বাভাবিক। এ সত্যটাকে উপলব্ধি করেই আমাদের কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে। সমস্যাটিকে দুই দিক দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। একদিকে যেমন শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে কারখানাগুলোর নিজেদের ঘর সামলাতে হবে তেমনি বিদেশী শক্তি এবং দেশীয় রাজনৈতিক দল ও এনজিওরা যেন অবস্থার অবনতি ঘটতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের দুরাবস্থার কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই বাজারে এক হাজার টাকায় কি হয়? ঢাকা শহরের অনেক এলাকায় ঘর মোছা, বাসন মাজা, কাপড় ধোয়া ও তরকারী কোটা - এই চারটি কাজ করে একজন বুয়া এক একটি বাসা থেকে মাসে ৮০০ টাকা আয় করে। তিনটি বাসায় কাজ করলেই তার আড়াই হাজার টাকা হয়ে যায়। তার পর সন্নার আগেই সে বাসায় ফিরতে পারে। এই শহরে একজন ভিক্ষুকও মাসে দেড় হাজার টাকার কম আয় করে না। অথচ, প্রশিক্ষিত এই সকল শ্রমিক, যাদের উপর দেশের অর্থনীতি দাড়িয়ে আছে, তারা মাসে হাজার টাকাও পায় না। কিন্তু মালিকেরা তাদের বেতন বাড়াবেন না, তাদেরকে ছুটি দেবেন না, এটুকু নিশ্চয়তা দিবেন না যে, কাজ করতে এসে আঙুনে পুড়ে বা ছাদ ভেঙ্গে তাদেরকে মরতে হবে না। তারা এমনভাবে কথা বলেন যে, এই সকল নূন্যতম কিছু সুযোগ-সুবিধা দিলে তাদের ব্যবসায় লালবাতি জ্বলবে।

বিজিএমইএর দেয়া তথ্য অনুযায়ী গার্মেন্টস কারখানাগুলো ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে পোষাক রপ্তানী করে আয় করে ৬৪১৮ মিলিয়ন ডলার বা ৪৪ হাজার কোটি টাকা। এ সকল কারখানায় কাজ করে বিশ লক্ষ শ্রমিক। একজন শ্রমিকের গড় মাসিক বেতন যদি ১৫০০ টাকা ধরা হয়, তাহলে বছরে বেতন বাবদ কারখানাগুলো খরচ করে ২৪০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ রফতানী আয়ের মাত্র ১৮ ভাগের একভাগ বা সাড়ে পাঁচ শতাংশ বেতন বাবদ খরচ হয়। পোষাক শিল্পের উৎপাদন ব্যয়ের ৬০ অংশ খরচ হয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের পিছনে। অন্যান্য খরচ বাদ দিলে রফতানী আয়ের শতকরা ৩০ ভাগ মালিকের লাভের খাতায় যায়। এদিকে আবার জনগনের করের টাকা দিয়ে সরকার গার্মেন্টস মালিকদের জন্য নগদ সহায়তা দিয়ে থাকে। এর পরিমাণে বছরে ৭০০ কোটি টাকার মত। এটি ঋণ নয়, দান। অর্থাৎ শ্রমিকদের বেতনের এক তৃতীয়াংশ জনগণই দিয়ে দেয়। তারপরেও এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, শ্রমিকদের বেতন একটু বাড়ানো হলে মালিকের লোকসান গুনতে হবে?

গার্মেন্টস মালিকেরা শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ও কাজের পরিবেশের প্রসঙ্গ উঠলেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। একটি দৈনিকে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে এফবিসিসিআই এর একজন সাবেক সভাপতি বলেছেন যে,

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে যেমন বেতনে পাবে, শ্রমিক নিবে এটাই স্বাভাবিক। নূন্যতম মজুরী সেখানে বেআইনী। ‘মুক্ত’ আর ‘প্রতিযোগিতা’ শব্দ দুটি বর্তমান সময়ের শোষণের সবথেকে বড় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। যে প্রতিযোগিতার কথা বলা হচ্ছে তা নিতান্তই অসম ও অন্যায্য। এর একদিকে রয়েছে বিপুল অর্থ ও ক্ষমতামালী মালিক পক্ষ যারা যথেষ্ট সংগঠিতও। অপরদিকে রয়েছে একদল নিঃস্ব নারী। এক মাস কাজ না থাকলে তাদের পেটে ভাত জুটবে না, মাথা গোজার ঠাঁই থাকবে না। সেই শ্রমিকদের সংগঠন করার কোন অধিকার নেই। তাহলে কিভাবে এই নিঃস্ব, দুর্বল, অসংগঠিত শ্রমিকেরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবে? মুক্ত ও অসম প্রতিযোগিতাই যদি সব ন্যায় অন্যায় নির্ধারণ করে দিবে, তাহলে সাধারণ জনগণের করের টাকা দিয়ে কেন বছর বছর মালিকদেরকে নগদ সহায়তা দেয়া হচ্ছে? একজন রিক্সা চালককেও ভ্যাট হিসাবে কর দিতে হয়। অথচ, কেন তাদেরকে বিভিন্ন খাতে কর ও শুল্ক ছাড় দেয়া হচ্ছে?

অনেকেই বলছেন, গার্মেন্টস শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে তার নেতৃত্ব বেতন-ভাতা, কাজের পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে মালিকদের সাথে দরকষাকষি করতে পারতো এবং শ্রমিকদের পক্ষ হয়ে কাজ করতে পারতো। মারাত্মক কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তা সামাল দিতে মালিক পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের সাথে বসতে পারতো। কিন্তু এ অস্বীকার করার উপায় নেই যে ট্রেড ইউনিয়ন চালু হলে এ শিল্প টিকিয়ে রাখাই দুস্কর হয়ে পড়বে। ট্রেড ইউনিয়নের ব্যবস্থা করা মানে হচ্ছে কিছু লোককে সর্বদা গোলমাল ও অস্থিরতা তৈরীর জন্য নিয়োজিত রাখা। যত সমস্যা থাকবে, ততো নেতার কদর বাড়বে। তাই কদর বাড়ানোর জন্য হলেও নেতা সমস্যা তৈরী করবেন।

তাহলে সমাধান কোথায়? এখানে সরকার একটা ভূমিকা রাখতে পারে। সরকার একটি শ্রমিক কল্যাণ দফতর খুলতে পারে, যার কাজ হবে শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা দেখা। তাছাড়া পোষাক শিল্প মালিকদেরকে সরকার যে নগদ সহায়তা দিয়ে থাকে, তার একটি অংশ সরাসরি শ্রমিকদের জন্য ব্যয় করা যেতে পারে। ধরুন এ সহায়তার শতকরা ৫০ ভাগ দেয়া হলো মালিককে, ২৫ ভাগ শ্রমিকদেরকে বাৎসরিক বোনাস হিসাবে এবং অবশিষ্ট ২৫ ভাগ খরচ করা যেতে পারে তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা ইত্যাদি খাতে। শ্রমিকেরা অধিকাংশই অশিক্ষিত। তাদেরকে যদি শিক্ষিত করে তোলা যায় এবং পোষাক শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে তাদেরকে যদি প্রশিক্ষণ দেয়া যায়, তাহলে যে প্রতিযোগিতার কথা মালিকেরা বলছেন, তাতে তারা যোগ দিতে পারবে। যেখানে একজন সাধারণ শ্রমিক এক হাজার টাকারও কম বেতন পায় সেখানে ফ্লোর ইন চার্ম ও প্রোডাকশন ম্যানেজারের মত পদে বেতন ৩০-৪০ হাজার টাকাও অতিক্রম করে যায়। বিদেশেও প্রশিক্ষিত গার্মেন্টস শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে শ্রমিকদের সামনের বন্ধ দুয়ার খুলে যাবে। বিভিন্ন এনজিও গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য কাজ করে বলে দাবী করে। সরকারের পাশাপাশি তাদেরও উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে ক্ষমতায়িত করার কাজে এগিয়ে আসা।

শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনাটুকু দেয়ার পাশাপাশি বাইরের ষড়যন্ত্র মোকাবেলার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। এর মূল দায়িত্ব সরকারের। সাধারণ জনগণকে হয়রানি করে উৎকোচ আদায়ে আমাদের পুলিশ ও গোয়েন্দারা যতটা পারদর্শী, আইন শৃংখলা রক্ষায় তারা ততটাই অকেজো। পুলিশকে টেলে সাজাতে হবে এবং তাদের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। বর্তমানের মত দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়ে বাংলাদেশ তার সামনের দিনকার চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে পারবে না।